৪

তত্ত্ব এবং গবেষণার মধ্যে সম্পর্ক
Relationship beteween Theory and Research

তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। গবেষক তত্ত্ব থেকে নির্বাচিত গবেষণার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়গুলোকে কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত করে অনুকল্প পরীক্ষা করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তত্ত্বকে পুনর্গঠন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন। আবার অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়। বিমূর্ততার মাত্রার ভিত্তিতে তত্ত্বের শ্রেণী বিভক্তিকরণ করা যায়। তত্ত্বের ভিত্তিতে গবেষণা করা হবে, না কি গবেষণার ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মিত হবে, এ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। যে বিতর্কই থাকুক না কেন গবেষককে জানতে হবে যে, প্রত্যয় বলতে কি বোঝায়? প্রত্যয় কি কি কার্য সম্পাদন করে? প্রত্যয় ও চলকের মধ্যে সম্পর্ক কি? গবেষকের আরো জানা প্রয়োজন যে, অনুকল্প কি? অনুকল্প কিভাবে নির্মিত হয় ও এর নির্মাণে সমস্যা কি? অনুকল্প পরীক্ষা কি? ইত্যাদি। এ সব বিষয় নিয়ে এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে। তবে বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে পাঠ ৩-এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে "সামাজিক পরিসংখ্যান পরিচিতি" (সমাজতত্ত্ব-৪) গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশের সাথে সাদৃশ্য থাকবে।

এই ইউনিটে আমরা যে পাঠগুলো অধ্যয়ন করবো, সেগুলো হলো:

- পাঠ - ১ : তত্ত্ব বনাম গবেষণা
- পাঠ - ২ : প্রত্যয় ও চলক
- পাঠ - ৩ : অনুকল্প

পাঠ - ১

তত্ত্ব বনাম গবেষণা
Theory versus Research

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- তত্ত্ব কী
- তত্ত্বের প্রকারভেদ
- আদর্শ কী
- সামাজিক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকা
- তত্ত্ব বনাম গবেষণা
- তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক সম্পর্ক

তত্ত্ব কী (What is Theory)?

একটি উত্তম তত্ত্ব হলো নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের প্রত্যয়গত ভিত্তি।

বিভিন্ন মানুষের কাছে 'তত্ত্ব' পদটি বিভিন্ন অর্থ বহন করে। অদক্ষ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকেন একটি প্রবচনের মাধ্যমে: 'বিষয়টি তত্ত্বগত দিক থেকে ঠিক আছে, তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়'। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ ও অদক্ষ মানুষের জন্য এই প্রবচনটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করলেও প্রবচনটির মধ্যে যে বক্তব্যটি অন্তর্নিহিত রয়েছে তা হলো, 'তত্ত্ব প্রয়োগযোগ্য নয়'। তত্ত্ব ও প্রয়োগের সম্পর্কটির উপর প্রচলিত ধারণাটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আরেকভাবে প্রতিফলিত হয়। যেমন, আমরা বলে থাকি যে, 'অনেক ক্ষেত্রে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভ্রান্তির (trial and error) মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়'। এ ক্ষেত্রে, 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' হলো প্রয়োগ এবং 'ভ্রান্তি' হলো তত্ত্ব। যখন তত্ত্ব প্রায়োগিক অনুশীলনে কার্যকর হয় না, তখন তা সংশোধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নীতিগতভাবে তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। একটি উত্তম তত্ত্ব হলো নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের প্রত্যয়গত ভিত্তি। যে কোন প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে এবং বুদ্ধিমান ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তত্ত্ব আমাদের সাহায্য করে।

যখন তত্ত্বকে দর্শনের সাথে বিকল্প রূপে বিবেচনা করা হয়, তখন তত্ত্ব সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা তৈরি হয়। যেমন, প্লেটো, এরিস্টোটল, লক, মার্ক্স এবং পেরেটো-এর মতো ধ্রুপদী পন্ডিতদের লেখাকে তত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানে তত্ত্ব দর্শনের বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান ছিল, বিশেষ করে নৈতিকতার দর্শনের উপর গুরুত্বটি ছিল প্রধান। যেমন, প্লেটোর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণ কি হবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সে বিষয়ে দার্শনিক রাজার নিরঙ্কুশ জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু নৈতিক দর্শন মূল্যবোধপ্রসূত মতামত প্রদান করে থাকে। সেগুলো না সত্য, না মিথ্যা। কারণ, সেগুলো অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পরীক্ষাযোগ্য নয়। যদি একজন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমাজতন্ত্রই হলো শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তবে কোন অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণই সে বিশ্বাসকে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারবে না। বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব হলো অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের বিভিন্ন বিষয়কে প্রতিনিধিত্বকারী বিমূর্ততা।

অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার অন্যতম প্রধান কাজটি হলো তত্ত্বের বিকাশ ঘটানো, এর পরিমার্জন করা এবং তত্ত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিজ্ঞানের লক্ষ্য অর্জনকে বেগবান করে তোলা।

সামাজিক বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে, অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার অন্যতম প্রধান কাজটি হলো তত্ত্বের বিকাশ ঘটানো, এর পরিমার্জন করা এবং তত্ত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিজ্ঞানের লক্ষ্য অর্জনকে বেগবান করে তোলা। কিন্তু তত্ত্ব কাকে বলে এ বিষয়ে তারা একমত হতে পারেন নি। সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে George Homans বলেছেন যে, সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানীরা তত্ত্ব নির্মাণে নিজেদের ব্যস্ত রাখলেও তত্ত্ব কি এ বিষয়ে কদাচিৎ পরিস্কারভাবে কিছু বলেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা তত্ত্বের প্রকৃতি আলোচনায় তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে যা বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে যে ধরণের তত্ত্বের জন্ম দেন তা তত্ত্ব

সম্পর্কে তাদের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তিকেই প্রদর্শন করে। কিছু সামাজিক বিজ্ঞানী রয়েছেন, যারা যে কোন প্রত্যয়িকরণকেই তত্ত্ব বলবেন। যেমন, অভিজ্ঞতামূলক প্রপঞ্চকে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করার জন্য 'ক্ষমতা', 'সামাজিক মর্যাদা', 'গণতন্ত্র', 'আমলাতন্ত্র' ও 'আপেক্ষিক বঞ্চনার' মত প্রত্যয়ের ব্যবহারকে তত্ত্বের সাথে সমার্থক করা হয়। এ ধরণের ব্যাপক অর্থে, পর্যবেক্ষণের বিপরীতে যে কোন ধরণের প্রত্যয়িকরণই হলো তত্ত্ব। আরেক ধরণের সামাজিক বিজ্ঞানী রয়েছেন, যারা 'ধারণার ইতিহাসকে' তত্ত্বের সাথে সমার্থক করেন। আবার অনেকে তত্ত্বকে সংকীর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এদের মতে, তত্ত্ব হলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌক্তিক অবরোহী প্রক্রিয়া, যা থেকে কতগুলো পরীক্ষাযোগ্য প্রস্তাবনাকে অবরোহীভাবে আহরণ করা যায়। তত্ত্ব সংজ্ঞায়নের এই বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরণের বিভ্রান্তি তৈরি করে।

সাধারণভাবে, তত্ত্ব হলো যৌক্তিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কতগুলো প্রস্তাবনার সুসংবদ্ধ উপস্থাপন, যা সামাজিক প্রপঞ্চসমূহকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানকে সংগঠিত ও সংক্ষিপ্ত করে এবং যা পরীক্ষা, পুনর্গঠন, পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বাস্তবতার যথার্থ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেবার জন্য যৌক্তিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই প্রস্তাবনাগুলোকে কিভাবে সাজানো যায় তার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। এই বিভিন্ন ধরণগুলোই বিজ্ঞানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বের জন্ম দেয়। বিষয়টিকে বোঝার জন্য তত্ত্বের ধরণগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

সাধারণভাবে, তত্ত্ব হলো যৌক্তিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কতগুলো প্রস্তাবনার সুসংবদ্ধ উপস্থাপন, যা সামাজিক প্রপঞ্চসমূহকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানকে সংগঠিত ও সংক্ষিপ্ত করে এবং যা পরীক্ষা, পুনর্গঠন, পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

তত্ত্বের প্রকারভেদ (Types of Theories)

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, তত্ত্বের এমন কোন সাধারণ সংজ্ঞা নেই যার উপর সামাজিক বিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেন। আমরা এও জেনেছি যে, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মিত হয়। অতএব, বোঝাই যাচ্ছে যে, তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। তত্ত্বকে তাদের পরিধির ভিত্তিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, সমষ্টিক তত্ত্ব (macro theories) ও ব্যষ্টিক তত্ত্ব (micro theories)। কার্যাবলীর ভিত্তিতেও তত্ত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু তত্ত্ব রয়েছে যেগুলো স্থিতিশীলতা বা গতিশীলতাকে নিয়ে আলোচনা করে এবং কিছু তত্ত্ব রয়েছে যেগুলো কাঠামো বা প্রক্রিয়াকে নিয়ে আলোচনা করে। কাঠামোর ভিত্তিতেও তত্ত্বকে বিভক্ত করা যায়। যেমন, যৌক্তিকভাবে সম্পর্কযুক্ত স্বতঃসিদ্ধমূলক তত্ত্ব এবং কিছু প্রস্তাবনার মাধ্যমে ঢিলেঢালাভাবে নির্মিত তত্ত্ব। আবার বিমূর্ততার মাত্রার ভিত্তিতেও তত্ত্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। বিমূর্ততার মাত্রার ভিত্তিতে Parsons ও Shils কর্তৃক প্রদত্ত চার ধরণের তত্ত্বকে আমরা নিম্নে আলোচনা করে দেখবো।

অনানুষ্ঠানিক শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থা (Ad Hoc Classificatory Systems): তত্ত্ব গঠনের সর্বনিম্ন পর্যায় হলো অনানুষ্ঠানিক শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থা। এই পর্যায়ে, অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে সংগঠিত করার জন্য কতগুলো স্বেচ্ছামূলক সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফা (arbitrary catigories) তৈরি করা হয়। উপাত্তকে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনার উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালায় উত্তরদাতাদের প্রদত্ত উত্তরের বিভিন্ন সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফাগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যেমন, বৈবাহিক মর্যাদার বিপরীতে প্রাপ্ত উত্তরগুলোকে অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্নতা, ইত্যাদি দফায় সাজানো হয়ে থাকে। এক ধরণের স্থূল শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে শ্রেণীবদ্ধকরণের এই প্রক্রিয়াকে অনানুষ্ঠানিক শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে।

অনানুষ্ঠানিক শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে সংগঠিত করার জন্য কতগুলো স্বেচ্ছামূলক সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফা তৈরি করা হয়।

শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলী (Taxonomies): দ্বিতীয় মাত্রার তত্ত্ব হলো সমবৈশিষ্টসম্পন্ন দফার শ্রেণীবিন্যাসের প্রণালী বা শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলী। এটি অভিজ্ঞাতালব্ধ পর্যবেক্ষণগুলোকে সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফার শ্রেণীবদ্ধকরণের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার প্রক্রিয়া, যাতে করে সেই শ্রেণী বা দফাগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ককে বর্ণনা করা যায়। শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলীর মাধ্যমে গঠিত সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফার শ্রেণীবিন্যাসগুলো অভিজ্ঞতার জগতের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক

শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলী অভিজ্ঞাতালব্ধ পর্যবেক্ষণগুলোকে সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফার শ্রেণীবদ্ধকরণের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার

বিজ্ঞানের গবেষণায় শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। এগুলোর সতর্ক ও সযত্ন সংজ্ঞায়ন অভিজ্ঞতাযোগ্য বাস্তবতার একককে বিশ্লেষণের জন্য সুনির্দিষ্ট করে এবং সেই এককগুলোকে কিভাবে বর্ণনা করা হবে তার দিক নির্দেশ করে। অর্থাৎ, এটি হলো শ্রেণীবদ্ধকরণ ও বর্ণনার জন্য একটি সুশৃঙ্খল বিন্যাস। যখন একজন গবেষক একটি গবেষণার বিষয়বস্তুকে নির্বাচন করেন, তখন গবেষক সেই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ চলকগুলোকে শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলীর মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারেন। শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলীর দ্বিতীয় কাজটি হলো, সংক্ষিপ্তকরণমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করা। তবে এ ধরণের তত্ত্ব শুধু বর্ণনা প্রদান করে, কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে না। Talcott Parsons-এর সামাজিক কর্মের বিশ্লেষণ এ ধরণের তত্ত্বের আওতায় পড়ে।

প্রত্যয়গত কাঠামোর মাধ্যমে বর্ণনামূলক শ্রেণীগুলোকে একটি বৃহৎ সুস্পষ্ট প্রস্তাবনার কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করা হয়।

প্রত্যয়গত কাঠামো (Conceptual Framework): তৃতীয় মাত্রার তত্ত্ব হলো প্রত্যয়গত কাঠামো। এর মাধ্যমে বর্ণনামূলক শ্রেণীগুলোকে একটি বৃহৎ সুস্পষ্ট প্রস্তাবনার কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করা হয়। প্রত্যয়গত কাঠামো শ্রেণীবিন্যাসের সুত্রাবলী থেকে উন্নত ধরণের তত্ত্ব। কারণ, এর প্রস্তাবনাগুলো অনেক বেশী অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণকে সংক্ষিপ্ত করে এবং ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে। সামাজিক বিজ্ঞানে যে সকল ধারণা তত্ত্ব বলে পরিচিত তাদের অধিকাংশই প্রত্যয়গত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, যা সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতামূলক গবেষণাকে পরিচালিত করে। কিন্তু প্রত্যয়গত কাঠামো থেকে আহরিত প্রস্তাবনাগুলো অবরোহীমূলকভাবে স্থাপিত হয় না। এটি সেগুলোর ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাকে সীমিত করে এবং সেগুলোর উপযোগীতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে একটি সুসংবদ্ধ উপায়ে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে তত্ত্বগত ব্যবস্থাগুলো শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলী ও প্রত্যয়গত কাঠামোকে একত্রিত করে।

তত্ত্বগত ব্যবস্থা (Theoretical Systems): বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে একটি সুসংবদ্ধ উপায়ে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে তত্ত্বগত ব্যবস্থাগুলো শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাবলী ও প্রত্যয়গত কাঠামোকে একত্রিত করে। এই মাত্রায়, অন্যান্য প্রস্তাবনা থেকে কতগুলো পরীক্ষাযোগ্য প্রস্তাবনাকে আহরণের অনুমতি প্রদানকারী পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রস্তাবনাগুলোর একটি যৌক্তিক অবরোহী প্রক্রিয়া হিসাবে তত্ত্ব তার সংজ্ঞাকে প্রতিফলিত করে। যখন এ ধরণের তত্ত্বগত ব্যবস্থা গঠিত হয়, তখন একজন বিজ্ঞানী দাবী করতে পারেন যে, তিনি তার আগ্রহের প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি তত্ত্বগত ব্যবস্থা হলো সেটি, যা অভিজ্ঞতামূলক প্রপঞ্চকে পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে, তত্ত্বগত কাঠামোর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে Durkheim-এর আত্মহত্যার তত্ত্বকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আদর্শ কী (What is a Model)?

সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যয়গত সংগঠনের ব্যবস্থা হিসাবে তত্ত্বের ধারণার সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত হলো আদর্শের ধারণা।

সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যয়গত সংগঠনের ব্যবস্থা হিসাবে তত্ত্বের ধারণার সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত হলো আদর্শের ধারণা। প্রায়শঃ, আদর্শের মাধ্যমে প্রত্যয়গত কাঠামো সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একটি আদর্শকে কোন কিছুর প্রতিরূপ বা সাদৃশ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, একজন স্থাপত্যবিদ বহুতলবিশিষ্ট ভবনের একটি আদর্শ তৈরি করে থাকেন। সেই আদর্শটি হলো প্রকৃত ভবনটির একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, যা ভবনটির বৈশিষ্ট্য ও কাঠামোকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানে ভৌতিক পদার্থের পরিবর্তে প্রতীকের মাধ্যমে আদর্শ তৈরি হয়। অর্থাৎ, কিছু অভিজ্ঞতামূলক প্রপঞ্চের সকল উপাদান এবং উপাদানের মধ্যে সম্পর্কসহ এর বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রত্যয়গুলোর মধ্যে যৌক্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, আদর্শ হলো বাস্তবতা থেকে সৃষ্ট একটি বিমূর্তকরণ, যা বাস্তবতাকে সকল বৈশিষ্ট্যসহ সংগঠিত করা এবং সহজবোধ্যভাবে উপলব্ধির উদ্দেশ্য সাধন করে। অতএব, আদর্শ হলো বাস্তবতার একটি প্রতিনিধিত্বশীল রূপ। কোন সমস্যার প্রাসঙ্গিক বাস্তব বিষয়গুলোকে চিত্রিত করে সেই সমস্যাকে অনুসন্ধান করা হয়। এটি সেই বিষয়গুলোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কগুলোকে সুস্পষ্ট করে তোলে এবং সেই সম্পর্কগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলকভাবে পরীক্ষাযোগ্য প্রস্তাবনা গঠনে সক্ষম করে। আদর্শকে পরীক্ষার পর বাস্তব জগতের কিছু অংশ সম্পর্কে একটি অধিকতর স্বচ্ছ উপলব্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়।

প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না এমন প্রপঞ্চ সম্পর্কে ধারণা পাবার জন্যও আদর্শকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, নীতিমালা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং কাঠামোর একটি আদর্শ নির্মাণ করা হয় এবং সেই আদর্শ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর আচরণ সম্পর্কে অবরোহীমূলকভাবে কিছু প্রস্তাবনা আহরণ করা হয়। তারপর, এই প্রস্তাবনাগুলোকে অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্তের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে, ভাবগত বিবেচনাবোধের তুলনায় আদর্শ অধিকতর সুশৃঙ্খল ভিত্তি প্রদান করে থাকে। আদর্শ হলো ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণীকরণের হাতিয়ার। যদি দক্ষতার সাথে নির্মাণ করা যায়, তবে সেগুলো বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আদর্শগুলো নিজেরা কখনো বাস্তবতা নয়। বাস্তবতাকে অধিকতর নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার জন্য নতুন জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে আদর্শ সব সময়ই পরিবর্তিত হয়। একটি বিজ্ঞানসম্মত আদর্শের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটিকে অভিজ্ঞতামূলকভাবে পরীক্ষা করা যায় এবং ভুল প্রমাণিত করা যায়।

একটি বিজ্ঞানসম্মত আদর্শের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটিকে অভিজ্ঞতামূলকভাবে পরীক্ষা করা যায় এবং ভুল প্রমাণিত করা যায়।

সামাজিক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকা (Role of Theory in Social Research)

সাম্প্রতিককালের মানবিক বিজ্ঞানগুলো গবেষণার বিভিন্ন উপাদান ও মূল পদগুলোর অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থের ব্যবহার, অপব্যবহার এবং বিভ্রান্তির দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এ সবের ব্যবহার এবং অর্থ নিয়ে মতানৈক্যের কারণে এর প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন মানবিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত মূল পদগুলোর স্বগোত্রীয় অর্থ থাকলেও এগুলো বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন অর্থে, বিভিন্ন দার্শনিক ঐতিহ্যে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে কোন সাধারণ ঐকমত্য নেই। কারণ, পন্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিভিন্ন তত্ত্ববিদ্যাগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান অনুযায়ী সামাজিক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকার পরিবর্তন হয়।

সামাজিক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে কোন সাধারণ ঐকমত্য নেই। কারণ, পন্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিভিন্ন তত্ত্ববিদ্যাগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান অনুযায়ী সামাজিক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকার পরিবর্তন হয়।

পন্ডিতেরা মনে করেন যে, শুধুমাত্র ব্যবহারের জন্যই গবেষণায় তত্ত্বের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন প্রকল্প ও অভিসন্দর্ভ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, তাত্ত্বিক উপস্থাপনের সাথে অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার কোন যোগাযোগ স্থাপিত না হবার ফলে তত্ত্বের সাথে প্রাপ্ত ফলাফল সংগতিপূর্ণ হয় না। তবে জটিল সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধিকাংশ পন্ডিত মনে করেন যে, বিমূর্ত মাত্রায় প্রকাশিত প্রত্যয়গুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্কগুলোকে দেখানোর জন্য এবং বিভিন্ন উপাদানের নির্বাচন ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক ধরণের তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। সেই তাত্ত্বিক কাঠামো পর্যবেক্ষণগুলোর সাথে বিমূর্ত তত্ত্বের একটি সংযোগ তৈরি করে। পর্যবেক্ষণের সাথে বিমূর্ত তত্ত্বগুলোর সংযোগ সাধনের মাধ্যমে প্রত্যয়গুলো অভিজ্ঞতামূলক অর্থ অর্জন করে।

তাত্ত্বিক কাঠামোর নীতিমালা অনুসরণ না করলে গবেষক দিক নির্দেশনাহীন হয়ে পড়েন এবং কোন উপাদানটিকে কোনটির আগে বা পরে বিবেচনা করবেন তা নির্ধারণ করতে গিয়ে দ্বিধান্বিত ও বিভ্রান্ড় হয়ে পড়েন।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, তত্ত্ব নির্বাচনটি প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত হতে হবে। একটি নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ও যথাযথ উপাদানগুলোকে নির্বাচন করতে সাহায্য করে। তত্ত্ব বাস্তব জগতের বিভিন্ন বিষয়কে উপলব্ধির জন্য এক ধরণের জাল হিসাবে কাজ করে, যার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকে সুসংগঠিত করা যায়। উপযুক্ত তত্ত্বের ব্যবহার একটি ছাকনীর মতও কাজ করে। ছাকনীর মাধ্যমে যেমন আবর্জনা দূর করে একটি বস্তুকে বিশুদ্ধ করে তোলা হয়, তেমনি উপযুক্ত তত্ত্বের ব্যবহার গবেষককে সঠিক দিক নিদের্শনা দিয়ে থাকে। তাত্ত্বিক কাঠামোর নীতিমালা অনুসরণ না করলে গবেষক দিক নির্দেশনাহীন হয়ে পড়েন এবং কোন উপাদানটিকে কোনটির আগে বা পরে বিবেচনা করবেন তা নির্ধারণ করতে গিয়ে দ্বিধান্বিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

তত্ত্ব বনাম গবেষণা (Theory versus Research)

বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে সামাজিক বিজ্ঞান দু'টি প্রধান উপাদানের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি হলো তত্ত্ব এবং অন্যটি হলো গবেষণা। বিজ্ঞানী হিসাবে সামাজিক বিজ্ঞানীরা দু'টি জগতে ক্রিয়াশীল থাকেন — পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার জগৎ, এবং ধারণা, তত্ত্ব ও আদর্শের জগৎ। দু'টি জগতের মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম ও শক্তিশালী হয়। কিন্তু কিভাবে এই সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে? প্রথমে কি আমরা তত্ত্ব ও আদর্শ নির্মাণ করে নেব এবং পরে

সেগুলোকে পরীক্ষার জন্য অভিজ্ঞতার জগতে যাবো, না কি অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্বকে নির্মাণ করবো? এ বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। একদল সামাজিক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, গবেষণায় যাবার পূর্বে তত্ত্ব নির্মাণ করতে হবে, এবং অন্যদল মনে করেন যে, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মাণ করতে হবে। দু'টি মতকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখা যাক।

গবেষণার পূর্বে তত্ত্ব (Theory before Research): আমরা উল্লেখ করেছি যে, কিছু সামাজিক বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা মনে করেন যে, তত্ত্বকে আগে আসতে হবে এবং গবেষণা তত্ত্বকে অনুসরণ করবে। এটিকে প্রায়শঃ, তত্ত্ব-তারপর-গবেষণা কৌশল (theory-then-research strategy) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এই মতামতটিকে সবচেয়ে সুসংবদ্ধভাবে বিকশিত করেছেন Karl Popper। তাঁর মতে, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ঘটে অনুমানমূলক ধারণার বিকাশ এবং তারপর অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার মাধ্যমে সেগুলোকে খন্ডনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তিনি তত্ত্ব নির্মাণে গবেষণার নিয়মিত অবদানকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন যে, গবেষণা কদাচিৎ নতুন তত্ত্বের জন্ম দেয় এবং তত্ত্ব গঠনের জন্য গবেষণা কখনোই একটি যৌক্তিক পদ্ধতি হিসাবে কার্যকর নয়। এই কৌশলটিকে কিছু সরলীকরণ করলে দেখা যায় যে, এটি পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করেঃ

- *প্রথমে*, একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব বা আদর্শ গঠন করা হয়।
- *দ্বিতীয় ধাপে*, অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানের জন্য গঠিত তত্ত্ব বা আদর্শটির মধ্য থেকে একটি প্রস্তাবনাকে আহরণ করতে হয়।
- *তৃতীয় ধাপে*, প্রস্তাবনাটিকে পরীক্ষার জন্য একটি গবেষণা প্রকল্প তৈরি করতে হয়।
- *চতুর্থ ধাপে*, যদি তত্ত্ব থেকে আহরিত প্রস্তাবনাটি অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্ত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়, সে ক্ষেত্রে, হয় তত্ত্বটিকে, নতুবা গবেষণা প্রকল্পটিকে সংশোধন করতে হয়।
- *পঞ্চম ধাপে*, যদি প্রস্তাবনাটি প্রত্যাখ্যাত না হয়, সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য নতুন প্রস্তাবনা নির্বাচন করতে হয়, বা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তত্ত্বের আরো উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হতে হয়।

তত্ত্বের পূর্বে গবেষণা (Research before Theory): তত্ত্ব-তারপর-গবেষণা কৌশলের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী সামাজিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা-তারপর-তত্ত্ব কৌশলটি (research-then-theory strategy) অবলম্বন করেন। এই কৌশলের প্রধান প্রবক্তা হলেন Robert K. Merton। তিনি যুক্তি তোলেন যে, গবেষণা তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ ও অনুকল্প পরীক্ষার পরোক্ষ ভূমিকাই শুধু পালন করে না, এটি তত্ত্ব গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকাও পালন করে। গবেষণা তত্ত্বের বিকশিত রূপ প্রদানে অন্ততঃ চারটি কার্য সম্পাদন করে। *প্রথমতঃ*, এটি তত্ত্ব গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে; *দ্বিতীয়তঃ*, এটি তত্ত্বকে পুনর্গঠিত করে; *তৃতীয়তঃ*, এটি তত্ত্বকে বিভিন্নমুখী করে তোলে; এবং *চতুর্থতঃ*, এটি তত্ত্বকে শোধন করে। অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা তত্ত্বের জন্য নতুন সমস্যার দিক নির্দেশ করে, নতুন তাত্ত্বিক পুনর্গঠন বা সূত্রবদ্ধকরণকে আহবান করে, এবং যথার্থতা প্রমাণের কার্য সম্পাদন করে। গবেষণা-তারপর-তত্ত্ব কৌশলটি নিম্নলিখিত চারটি ধাপ অনুসরণ করে।

- *প্রথম ধাপে*, একটি প্রপঞ্চকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে বর্ণনা করে।
- *দ্বিতীয় ধাপে*, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে চিহ্নিত বৈশিষ্টগুলোকে পরিমাপ করে।
- *তৃতীয় ধাপে*, সম্পর্কের রূপগুলোর মধ্যে কোন সুসংবদ্ধ ভিন্নতা রয়েছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য প্রাপ্ত উপাত্তকে বিশ্লেষণ করে।
- *চতুর্থ ধাপে*, যখন সুসংবদ্ধ রূপগুলো আবিষ্কৃত হয়ে যায়, তখন একটি তত্ত্ব গঠিত হয়। সেই তত্ত্ব স্থুল থেকে সূক্ষ্ম যে কোন ধরণের হতে পারে।

উপরিল্লিখিত বিতর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, উভয় কৌশলই তত্ত্বকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রকাশ হিসাবে গণ্য করেছেন। দ্বিধাটি রয়েছে কেবলমাত্র গবেষণা প্রক্রিয়ায় তত্ত্বের অবস্থানটি কোথায় হবে তা নিয়ে। গবেষণা পরিচালনায় এ দু'টি প্রান্তিক বিতর্কের কোনটিকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, এই বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও সামাজিক বিজ্ঞান তার আপন গতিতে বিকশিত হয়েছে এবং দু'টি কৌশলের অধীনেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে। উপরন্তু, দু'টি কৌশলের মধ্যে বৈপরীত্যটি যতটা না বাস্তব তারচেয়ে বেশী আপাতদৃষ্টিতে প্রতিয়মান। প্রকৃতপক্ষে, তত্ত্ব ও গবেষণা প্রতিনিয়ত মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে বিকশিত করে চলেছে।

উভয় কৌশলই তত্ত্বকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রকাশ হিসাবে গণ্য করেছেন। দ্বিধাটি রয়েছে কেবলমাত্র গবেষণা প্রক্রিয়ায় তত্ত্বের অবস্থানটি কোথায় হবে তা নিয়ে। ... তত্ত্ব ও গবেষণা প্রতিনিয়ত মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে বিকশিত করে চলেছে।

তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship between Theory and Research)

তত্ত্ব এবং গবেষণা একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৌলিক পূর্ব ধারণা ও নীতি-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তত্ত্ব গবেষণাকে পথ প্রদর্শন করে। অন্যদিকে, গবেষণা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, সূত্রবদ্ধকরণ, পূণর্গঠন ও সংশোধনের পদ্ধতি ও কৌশল প্রদান করে। তত্ত্ব ও গবেষণার এই পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্কটি অবরোহ ও আরোহ যুক্তির মাধ্যমে একটি বৃত্তাবর্ত তৈরি করে, যা চিত্র ৪.১.১-এ উপস্থাপন করা হলো।

মৌলিক পূর্ব ধারণা ও নীতি-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তত্ত্ব গবেষণাকে পথ প্রদর্শন করে। অন্যদিকে, গবেষণা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, সূত্রবদ্ধকরণ, পূণর্গঠন ও সংশোধনের পদ্ধতি ও কৌশল প্রদান করে।

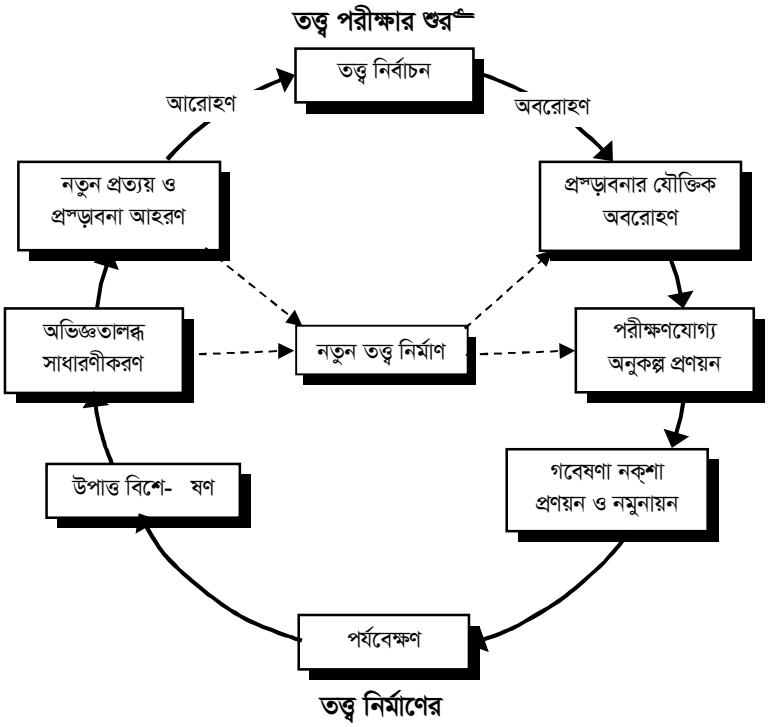

চিত্র ৪.১.১: তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক সম্পর্ক

তত্ত্ব ও গবেষণার বৃত্তাবর্তের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্বের পরীক্ষা এবং তত্ত্ব নির্মাণ দু'টি উদ্দেশ্যই সাধন করা যায়। তত্ত্ব পরীক্ষার ক্ষেত্রে অবরোহী যুক্তির নীতিমালাকে অনুসরণ করা হয়। অবরোহীমূলক গবেষণার শুরু হয় একটি তত্ত্ব নির্বাচন করে সেই তত্ত্ব থেকে যৌক্তিকভাবে কতগুলো প্রস্তাবনা আহরণের মাধ্যমে। সেই প্রস্তাবনাগুলো থেকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয়গুলোকে চিহ্নিত করে প্রধান চলকগুলোর ভিত্তিতে কতগুলো পরীক্ষাযোগ্য অনুকল্প নির্মাণ করতে হয়। এই অনুকল্পগুলোই গবেষক কি ধরণের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন তা নির্ধারণ করে। অনুকল্পগুলোর সত্যতা প্রমাণের জন্য অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

অবরোহীমূলক গবেষণার শুরু হয় একটি তত্ত্ব নির্বাচন করে সেই তত্ত্ব থেকে যৌক্তিকভাবে কতগুলো প্রস্তাবনা আহরণের মাধ্যমে।

আরোহী গবেষণায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে উপসংহার টানা হয়।

অন্যদিকে, আরোহী গবেষণায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে উপসংহার টানা হয়। এই উপসংহারগুলোর উপর ভিত্তি করে কতগুলো সাধারণীকরণ করে সেই সাধারণীকরণগুলোকে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। যদি সাধারণীকরণগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেগুলোর মাধ্যমে তত্ত্ব নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আরোহী গবেষণা অনুকল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে না। গবেষক তার উপাত্তের মধ্যে এক ধরণের সাধারণ রূপ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেন। চলকগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে সেই সাধারণ রূপগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব গবেষক এবং সব গবেষণার উদ্দেশ্য তত্ত্ব নির্মাণ নয়। বহু পদ্ধতিবিজ্ঞানী এবং গবেষকের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাটি হলো গবেষণার মাধ্যমে এমন কিছু ফলাফলের জন্ম দেয়া, যা হয় একটি তত্ত্বকে, বা সেই তত্ত্বের অধীনস্ত প্রস্তাবনাগুলোকে, বা সেই প্রস্তাবনা থেকে আহরিত অনুকল্পগুলোকে সমর্থন করে। অনেক গবেষক রয়েছেন, যাদের কাছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে তত্ত্ব নির্মাণের বিষয়টি খুব কম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এ ছাড়া, সব ধরণের গবেষণা তত্ত্ব নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে না এবং সে উদ্দেশ্যে পরিচালিতও হয় না। যেমন, বহু দৃষ্টবাদী গবেষক তাদের গবেষণাকে তত্ত্ব নির্মাণের পরিবর্তে বর্ণনা ও শ্রেণীবদ্ধকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পছন্দ করেন। অন্য দৃষ্টবাদীরা তত্ত্বের পরিবর্তে আদর্শ রূপ (paradigm) নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব থেকে পর্যবেক্ষণের অবরোহী পথ ধরে তত্ত্ব প্রমাণের জন্য পরীক্ষা করেন এবং পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণীকরণের আরোহী পথ ধরে তত্ত্ব নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হন। তত্ত্ব পরীক্ষার জন্য প্রক্রিয়াটি শুরু হয় তত্ত্ব থেকে এবং তত্ত্ব নির্মাণের জন্য প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পর্যবেক্ষণ থেকে। দু'টি প্রক্রিয়ার মধ্যেই গবেষণা প্রক্রিয়াটি সম্পৃক্ত।

সামাজিক বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব থেকে পর্যবেক্ষণের অবরোহী পথ ধরে তত্ত্ব প্রমাণের জন্য পরীক্ষা করেন এবং পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণীকরণের আরোহী পথ ধরে তত্ত্ব নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হন।

সারাংশ

সাধারণভাবে গবেষণা বলতে তথ্য সংগ্রহ করে বর্ণনা করাকেই আমরা বুঝে থাকি। কিন্তু বাস্তবে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে তত্ত্বের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান পাঠে গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় আমরা দেখেছি পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্ব নির্মাণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়, আবার তত্ত্বের যথার্থতা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। অন্যকথায়, তত্ত্ব ও গবেষণা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। _____ বলেছেন যে, সমাজবিজ্ঞানীরা তত্ত্ব নির্মাণে নিজেদের ব্যস্ত রাখলেও তত্ত্ব কি এ বিষয়ে কদাচিৎ পরিস্কারভাবে কিছু বলেছেন।

ক. কার্ল মার্কস
খ. অগাষ্ট কোঁৎ
গ. জর্জ হোমান্‌স
ঘ. এমিল ডুরখেইম

২। আদর্শ (মডেল) হলো:

ক. তথ্য উপস্থাপনের হাতিয়ার
খ. তত্ত্ব তৈরির হাতিয়ার
গ. তথ্য ও তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার হাতিয়ার
ঘ. ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীকরণের হাতিয়ার।

৩। অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে উপসংহারে উপনিত হওয়াকে বলা হয়:

ক. আরোহী গবেষণা
খ. অবরোহী গবেষণা
গ. বর্ণনামূলক গবেষণা
ঘ. ব্যাখ্যামূলক গবেষণা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। তত্ত্ব কী?

২। আদর্শ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। তত্ত্ব কী? তত্ত্বের প্রকারভেদসমূহ আলোচনা করুন?

২। সামাজিক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকা আলোচনা করুন?

৩। তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করুন?

পাঠ - ২

প্রত্যয় ও চলক
Concepts and Variables

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- প্রত্যয় কী
- ধারণা ও প্রত্যয়
- প্রত্যয়ের কার্যাবলী
- চলক কী
- চলকসমূহের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ

প্রত্যয় কী (What is Concept)?

গবেষণার জন্য একটি তত্ত্ব চিহ্নিত করে এবং গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করার পর কেউ মনে করতে পারেন যে, উপাত্ত সংগ্রহ করে তার পরীক্ষা করাই হলো পরবর্তী কাজ। কিন্তু তত্ত্ব চিহ্নিত করা এবং উপাত্ত সংগ্রহ করার মধ্যবর্তী পর্যায়ে আরো কিছু কর্মকান্ড রয়েছে যা তত্ত্ব ও উপাত্তকে সমন্বিত করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়গুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে তত্ত্বগত ও কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। প্রত্যয়গুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত না করলে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত চলক ও সূচকগুলোকে চিহ্নিত করা যাবে না। তত্ত্ব, চলক ও সূচকগুলোর ভিত্তিতেই উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ এবং অনুকল্প গঠন সম্ভব হয় বলে এগুলো চিহ্নিত করা এবং সংজ্ঞায়িত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আরোহী পদ্ধতিতে তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়কে সংজ্ঞায়িত করার বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, আমাদের জানা প্রয়োজন যে, প্রত্যয় কি? প্রত্যয় কি কি কার্য-সম্পাদন করে? প্রত্যয় ও চলকের মধ্যে সম্পর্ক কি?

আমাদের প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণের মধ্যে সবকিছুই কোন বস্তু বা বিষয়কে নিরঙ্কুশভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না। অনেক পর্যবেক্ষণ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে কিছু বিষয়ের সমরূপতা রয়েছে। একটি একক পর্যবেক্ষণের বিষয়ের তুলনায় পর্যবেক্ষণের এই সমরূপতার সমষ্টি যে কোন বিষয়কে অধিকতর সাধারণ করে তোলে। এই সাধারণ রূপটি এক পর্যায়ে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা বা ভাবের আদান প্রদানে বেশ উপযোগী হয়ে পড়ে। আমরা এই সাধারণ রূপটিকে একটি নামে নামায়িত করে থাকি। সেই নামগুলোই এক একটি পদ বা প্রত্যয় হিসাবে পরিচিত হয়। অর্থাৎ, একটি সাধারণ শিরোনামের অধীনে বেশ কিছু সংখ্যক ঘটনাকে আত্মিকরণের মাধ্যমে এ ধরণের সমরূপতার বিমূর্তায়নকে প্রত্যয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ।

প্রত্যয় হলো এক ধরণের বিমূর্তায়ন যা আমাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি মানসিক প্রতিচ্ছবিতে সংগঠিত করতে সাহায্য করে।

সাধারণভাবে, প্রত্যয় হলো এক ধরণের পদ যা কোন ঘটনা, পরিস্থিতি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। প্রত্যয়গুলো সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি অপরটির সাথে যুক্ত হয়। যেমন, যখন আমরা বলি যে, দরিদ্র মানুষ ধনীদের চেয়ে বেশী নিরাশাবাদী হয়, তখন 'দরিদ্র' ও 'ধনী' পদ দু'টির মাধ্যমে দু'টি ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় এবং 'নিরাশাবাদী' পদটি দিয়ে একটি মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়। এই তিনটি পদকে একটি সম্পর্কের মধ্যে যুক্ত করে দু'টি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি তুলনামূলক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য কথায়, প্রত্যয় হলো এক ধরণের বিমূর্তায়ন যা আমাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি মানসিক প্রতিচ্ছবিতে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন প্রত্যয় তাদের সূক্ষ্মতা, পরিধি, স্পষ্টতা এবং গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। সামাজিক গোষ্ঠী, মিথষ্ক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, সামাজিক মর্যাদা, শ্রেণী, পরিবার, ইত্যাদি হলো এ ধরণের প্রত্যয়ের কিছু উদাহরণ।

ধারণা ও প্রত্যয় (Conception and Concept)

মানব প্রজাতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, মানুষ কোন বিষয়কে শুধু অনুভবই করে না, বরং সে তার ইন্দ্রিয়গাহ্য অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাও করে। অভিজ্ঞতার এই বর্ণনায় মানুষ কিছু প্রতীক ব্যবহার করে যা যোগাযোগোর মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই প্রতীকগুলোর ব্যবহারের মধ্যে ভিন্নতার কারণে যোগাযোগের মধ্যে সূক্ষ্মতার পার্থক্য ঘটে। ফলে, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যয়িতকরণের সূক্ষ্মতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীকের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান সতর্কতার সাথে এই কাজটিই করে।

যে কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনে যে মানসিক প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে সে সকল মানসিক প্রতিচ্ছবিকে ধারণা বলা হয়।

যে কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনে যে মানসিক প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে সে সকল মানসিক প্রতিচ্ছবিকে ধারণা (conception) বলা হয়। এই ধারণাগুলোকে আমরা বিভিন্ন পদ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু এ সকল পদের মাধ্যমে আমরা যা বোঝাতে চাই তা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। কারণ, এ সকল ধারণা একেক জনের মনে একেকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। এ সকল ধারণার কিছু হয় বাস্তবসম্মত এবং অন্যগুলো নয়। এই ধারণাগুলো অস্বচ্ছ এবং দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। ফলে একজনের মনের ধারণা অন্যের মনে সরাসরি ছাপ ফেলে না। তবে এ সকল ধারণার মধ্যে কিছু কিছু অংশের মিল থাকে। আমরা এই মিল পাওয়া অংশগুলো নিয়ে একটি পদকে বোঝানোর জন্য কার্যকর ঐকমত্যের (working agreement) মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য অর্থ আরোপ করে থাকি। একটি পদের অর্থ কি হতে পারে তার কার্যকর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে প্রত্যয়িকরণ (conceptualization) বলে।

বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত ভাষার অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকটি হলো 'প্রত্যয়'।

আমরা আমাদের চিন্তার যৌক্তিকতাটি প্রকাশ করি ভাষার মাধ্যমে। আর এই ভাষা হলো আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা বা ভাবের আদান প্রদানের একটি প্রক্রিয়া, যা কতগুলো প্রতীক এবং সেই প্রতীকগুলোর বহুমাত্রিক সংমিশ্রণসম্মত ব্যবহারের বিধিসম্মত নিয়মাবলীর সমন্বয়ে গঠিত। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত ভাষার অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকটি হলো 'প্রত্যয়'। অভিজ্ঞতালব্ধ পৃথিবীকে বর্ণনার জন্য প্রত্যয় গঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা গবেষণা প্রক্রিয়া শুরু করেন। অনেকগুলো ঘটনাকে একটি সাধারণ শিরোনামের অধীনে উপস্থাপনের মাধ্যমে চিন্তার প্রক্রিয়াকে সহজ করাই এর উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু প্রত্যয় রয়েছে। এগুলো বিজ্ঞানীদের পেশাগত ভাষা গঠন করে এবং তাদের তথ্যকে বহন ও প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিছু প্রত্যয় রয়েছে যেগুলো প্রতিনিধিত্বকারী বস্তু বা তথ্যের খুব কাছাকাছি হয়। যেমন, 'মানুষ' প্রত্যয়টি দিয়ে একজন মানুষকে দেখানো বা বোঝানো খুব সহজ হয়। কেননা, মানুষ নামের দৃশ্যমান বস্তুটি সহজেই দেখা যায়। মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে এই প্রত্যয়টি নির্মাণ করা হয়েছে তা সহজেই পর্যবেক্ষণযোগ্য। কিন্তু কিছু প্রত্যয় রয়েছে যা খুব সহজেই বোঝানো বা দেখানো সম্ভব হয়ে উঠে না। যেমন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, হিংসা, মর্যাদা, ন্যায় বিচার, প্রত্যাশা, বিদ্বেষ, গণতন্ত্র, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি হলো এ ধরণের কিছু প্রত্যয়। এ সকল প্রত্যয়কে বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

প্রত্যয় একটি বিমূর্ত ধারণা, যা একটি বস্তু, বা সেই বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্য, বা কোন আচরণগত প্রপঞ্চের প্রতিনিধিত্বশীল রূপ।

তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চ হিসাবে অস্তিত্বমান নয়, সেগুলো বরং বাস্তবে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের প্রতীক। অন্য কথায়, প্রত্যয় একটি বিমূর্ত ধারণা, যা একটি বস্তু, বা সেই বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্য, বা কোন আচরণগত প্রপঞ্চের (phenomenon) প্রতিনিধিত্বশীল রূপ। একটি প্রত্যয় হলো কতগুলো ধারণার পরিবার। এক একটি প্রত্যয় হলো এক একটি নির্মাণ, যা কখনোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেখা যায় না। কারণ, সেগুলোর অস্তিত্ব নেই, আমরা সেগুলোকে তৈরি করি। যেমন, 'শ্রেণী' প্রত্যয়টির কোন দৃশ্যমান অস্তিত্ব নেই, আমরা শ্রেণী কাঠামোকে বিনির্মাণ করি। এই প্রত্যয়গুলোর সাথে পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দূরত্ব যত বাড়বে, প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে ভুল বোঝার অবকাশ তত বাড়বে। পাশাপাশি, এগুলোর অসতর্ক ব্যবহারের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে, ততবেশী প্রয়োজন পড়বে সঠিক পরিমাপের।

প্রত্যয়ের কার্যাবলী (Functions of Concepts)

সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রত্যয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। *প্রথমতঃ*, প্রত্যয় হলো যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সর্বজনস্বীকৃত প্রত্যয় ছাড়া আন্তভাবগত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। প্রত্যয় ইন্দ্রীয়গত প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় এবং প্রাপ্ত ধারণাকে সার্বজনীনভাবে সঞ্চারণ করে। আমরা জানি যে, প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চ হিসাবে অস্তিত্বমান থাকে না। প্রত্যয় প্রপঞ্চ নয়, বরং এগুলো প্রপঞ্চের প্রতীক। *দ্বিতীয়তঃ*, প্রত্যয় এক ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিচিত করে, যা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চকে দেখবার দিক নির্দেশ করে। প্রত্যয় বিজ্ঞানীকে বাস্তবতার কিছু অংশকে সম্পর্কিত করতে এবং এর সাধারণ গুণাবলী প্রদানে সহায়তা করে। *তৃতীয়তঃ*, প্রত্যয় সাধারণীকরণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণের উপায় হিসাবে কাজ করে। বিজ্ঞানীরা প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে শ্রেণীবদ্ধ করেন, কাঠামোবদ্ধ করেন, ক্রমানুসারে সাজান এবং সাধারণীকরণ করেন। প্রতিটি প্রপঞ্চ তার বাস্তবতায় অনন্য। তাই কোন প্রপঞ্চই পরিপূর্ণ পূর্ণতায় প্রকাশিত হয় না। বিজ্ঞানী সাধারণীকরণ করতে গিয়ে সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা করেন। এই প্রয়োজনীয় মূল্যটুকু বিজ্ঞানীকে দিতে হয় বিমূর্ত সাধারণীকরণকে অর্জনের জন্য। কেননা, প্রত্যয়িকরণের অর্থ হলো কিছু মাত্রায় সাধারণীকরণ, আর সাধারণীকরণের অর্থ হলো কিছু বিষয়কে একইরূপ ধরে নিয়ে কিছু বিষয়কে বর্জন। যেমন, আমরা একটি বনের মধ্যে বিভিন্ন বৃক্ষের স্বাতন্ত্র্যকে অবজ্ঞা করে সকল বৃক্ষকে একটি সাধারণ নামে আখ্যায়িত করি এবং সেই বৃক্ষরাজীর সমন্বয়ে একটি বনকে উপলব্ধি করি। *চতুর্থতঃ*, প্রত্যয় তত্ত্বের উপাদান হিসাবে কাজ করে এবং ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে সহজতর করে।

চলক কী (What is Variable)?

আমরা জানি যে, একটি গবেষণা সমস্যা কতগুলো প্রত্যয় দিয়ে বর্ণনা করা হয়। আমরা এও জানি যে, প্রত্যয় অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চের নিষ্কাশিত বিমূর্ত রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যয়গত মাত্রা থেকে অভিজ্ঞতামূলক মাত্রায় অবস্থান্তর করতে হলে প্রত্যয়কে চলকে রূপান্তর করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই চলকগুলোই প্রত্যয়কে প্রতিফলিত করে এবং অনুকল্পের মধ্যে উপস্থাপিত হয়। প্রত্যয়কে কিছু মান বন্টনের মাধ্যমে চলকে রূপান্তর করা হয়। যেমন, কোন বস্তুর উপর সংখ্যা মান বরাদ্দের মাধ্যমে কিছু বস্তুকে মান বন্টন করে সংখ্যায় পরিণত করা হয়। সহজভাবে বলা যায় যে, একটি চলক হলো একটি অভিজ্ঞতামূলক বৈশিষ্ট্য, যা দুই বা ততোধিক মান গ্রহণ করে। যদি একটি বৈশিষ্ট্যের মানের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে তবে সেই বৈশিষ্ট্যকে চলক বলে। সামাজিক শ্রেণীকে চলক বলে গণ্য করা হয় এ জন্য যে, এই বৈশিষ্ট্যকে অন্তত পাঁচটি মানের মাধ্যমে আলাদা করা যায়। যেমন, নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ শ্রেণী। যে চলকের শুধুমাত্র দু'টি মান থাকে তাকে দ্বিপদী চলক বলে। যেমন, লিঙ্গ হলো একটি দ্বিপদী চলক। কারণ, এটির কমপক্ষে দু'টি মান রয়েছে – নারী ও পুরুষ। চলকের প্রকৃতিকে বোঝার জন্য বিভিন্ন চলকের মধ্যে পার্থক্যকে বোঝা প্রয়োজন।

অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete and Continuous Variables): চলকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সেগুলোর অবিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্নতার প্রকৃতি। এই বৈশিষ্ট্য গবেষণা কর্মকান্ডের মধ্যে পরিমাপ পদ্ধতি, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সাধারণীকরণকে প্রভাবিত করে। একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের কোন সর্ব-নিম্ন আকারের একক নেই। যেমন, একটি বিশেষ বস্তু ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ হতে পারে, সেটি ১০.৫ ইঞ্চি হতে পারে, আবার সেই বস্তুটি ১০.৫৪৩২৮৫১ ইঞ্চি দীর্ঘও হতে পারে। অন্যদিকে, বিচ্ছিন্ন চলকের একটি সর্ব-নিম্ন আকারের একক রয়েছে। যেমন, একটি পরিবারের আকার ৫ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারে, কিন্তু কখনো ৫.৩ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারে না। ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ একটি বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ হতে পারে, কেন না মুদ্রার সর্ব-নিম্ন আকারের একক রয়েছে। একজন ব্যাংক থেকে ৫০ টাকা বা ৫০.৫ বা ৫০.৫২ টাকা তুলতে পারেন, কিন্তু কখনই ৫০.৫২৭৪৩ টাকা তুলতে পারেন না। কারণ, মুদ্রার সর্বনিম্ন একক হলো দশমিকের পর দুই এককের ভগ্নাংশ।

নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলক (Dependent and Independent Variables): গবেষক যে চলককে ব্যাখ্যা করতে চান সেই চলককে নির্ভরশীল চলক বলে এবং যে চলক নির্ভরশীল চলককে ব্যাখ্যা করে সেই চলককে স্বাধীন চলক বলে। নির্ভরশীল চলককে অনেক সময় মানদন্ড চলক (criterion variable) এবং স্বাধীন চলককে ব্যাখ্যাকারী চলক (explanatory variable) বলা হয়ে থাকে। গাণিতীক অভিব্যক্তি অনুযায়ী, নির্ভরশীল চলক সবসময় সমীকরণের বাম দিকে অবস্থান করে। যেমন, আমরা যদি একটি নির্ভরশীল চলককে y এবং স্বাধীন চলককে x দিয়ে চিহ্নিত করি, তবে সমীকরণের রূপটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

গবেষক যে চলককে ব্যাখ্যা করতে চান সেই চলককে নির্ভরশীল চলক বলে এবং যে চলক নির্ভরশীল চলককে ব্যাখ্যা করে সেই চলককে স্বাধীন চলক বলে।

$$y = f(x)$$

অর্থাৎ, y হলো x এর কার্য–কারণের ফল।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, একজন সামাজিক গবেষক কেন কিছু মানুষ অধিক পরিমাণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং অন্যরা করে না এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে চান। সামাজিক স্তরায়ন তত্ত্বের ভিত্তিতে গবেষক অনুমান করতে পারেন যে, একজন মানুষের সামাজিক মর্যাদা যত বেশী হবে সেই মানুষ ততবেশী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের ফলাফল হিসাবে অনুমান করা হয়েছে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে, সামাজিক শ্রেণী অবস্থানকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কারণ হিসাবে অনুমান করা হয়েছে। অতএব, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো নির্ভরশীল চলক এবং সামাজিক শ্রেণী হলো স্বাধীন চলক।

এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের মধ্যেকার পার্থক্যটি বিশ্লেষণধর্মী এবং কেবলমাত্র গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃত বাস্তবতায় কোন চলকই স্বাধীন বা নির্ভরশীল নয়। গবেষক তার গবেষণার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি সেগুলোকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। একটি অনুসন্ধানের স্বাধীন চলক অন্য অনুসন্ধানের নির্ভরশীল চলক হতে পারে। যেমন, আমাদের উদাহরণ অনুযায়ী রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে নির্ভরশীল চলক এবং এর ভিন্নতার কারণ হিসাবে সামাজিক শ্রেণীকে স্বাধীন চলক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু যদি একজন গবেষক সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের ভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করতে চান, তবে সে ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণী অবস্থান নির্ভরশীল চলকে পরিণত হয়। এই ভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য অন্য একটি চলককে স্বাধীন চলক হিসাবে অনুমান করা হয়। এ ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত যোগ্যতা সে রকম একটি স্বাধীন চলক বলে অনুমিত হতে পারে।

নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের মধ্যেকার পার্থক্যটি বিশে- ষণধর্মী এবং কেবলমাত্র গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃত বাস্তবতায় কোন চলকই স্বাধীন বা নির্ভরশীল নয়।

এ ছাড়াও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় আরো একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। সেটি হলো, অধিকাংশ সামাজিক প্রপঞ্চ একের অধিক চলকের ফলাফল হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। কারণ, একটি মাত্র চলকের মাধ্যমে কোন প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করলে তা দিয়ে নির্ভরশীল চলকের মধ্যেকার ভিন্নতার খুব কম অংশই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যখন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ভিন্নতাকে কেবলমাত্র সামাজিক শ্রেণী অবস্থান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাটি অসম্পূর্ণ হয়। কারণ, শ্রেণী অবস্থান ছাড়াও আরো অনেক চলক রয়েছে যা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ভিন্নতার জন্য দায়ী হতে পারে। এ সকল চলকের মধ্যে বয়স, লিঙ্গ, রাজনীতিতে আগ্রহ, রাজনৈতিক দক্ষতা, ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রক চলক (Control Variables): অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় নিয়ন্ত্রক চলকের কাজটি হলো স্বাধীন চলকের দ্বারা নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পার্থক্য ঘটানোর জন্য দায়ী নয় এমন চলকের ব্যাখ্যামূলক ক্ষমতা আরোপের ঝুঁকি হ্রাস করা। নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের মধ্যে একটি অভিজ্ঞতামূলকভাবে পর্যবেক্ষণকৃত মেকি সম্পর্কের (spurious relation) সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করার জন্য নিয়ন্ত্রক চলককে ব্যবহার করা হয়। মেকি সম্পর্ক হলো এক ধরণের সম্পর্ক যা স্বাধীন চলক ছাড়াও অন্যান্য চলক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। অন্য কথায়, সকল প্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাবকে নিষ্কাশিত করার পরও যদি নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের মধ্যেকার সম্পর্কটি প্রদর্শিত হয়, তবে বলা যাবে যে, সম্পর্কটি মেকি নয়। ধরা যাক, রাজনৈতিক দর্শন ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে,

অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় নিয়ন্ত্রক চলকের কাজটি হলো স্বাধীন চলকের দ্বারা নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পার্থক্য ঘটানোর জন্য দায়ী নয় এমন চলকের ব্যাখ্যামূলক ক্ষমতা আরোপের ঝুঁকি হ্রাস করা।

সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ (নির্ভরশীল চলক) কি রাজনৈতিক দর্শনের (স্বাধীন চলক) দ্বারা নির্ধারিত? আপাতঃদৃষ্টিতে হয়তো তাই। কিন্তু একজন গবেষক যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রক চলক হিসাবে পরীক্ষা করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, রাজনৈতিক দর্শন ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি উবে গেছে। এ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক দর্শন ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যেকার প্রাপ্ত সম্পর্কটিকে মেকি বলে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা রাজনৈতিক দর্শন ও সরকারী ব্যয় উভয়কেই প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরণের চলক রয়েছে। যেমন, গুণগত চলক (qualitative variables), পরিমাণগত চলক (quantitative variables), মধ্যবর্তী চলক (intervening variables), পূর্ববর্তী চলক (prior variables), পরীক্ষা চলক (test variables), বহিঃস্থিত চলক (exogenous variables), অন্তরিত চলক (endogenous variables), ইত্যাদি। এই চলকগুলোর প্রকৃতিকে বুঝতে হলে শুধুমাত্র সংজ্ঞাই যথেষ্ট নয়, চলকসমূহের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপকে বুঝতে হবে।

চলকের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ (Different Patterns of Relationship between Variables)

যে সকল চলক অন্য চলকের উপর নির্ভরশীল নয় বা যে সকল চলক অবস্থানগত দিক থেকে অনুকল্পের প্রথমে থাকে, সে সকল চলককে স্বাধীন চলক বা 'পূর্ববর্তী চলক' বলে।...যে সকল চলক নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের মাঝখানে অবস্থান করে সেগুলোকে 'মধ্যবর্তী চলক' বলে।

চলকের মধ্যে সম্পর্কের বিশদ বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা 'নির্ভরশীল চলক' এবং 'স্বাধীন চলক' পদগুলো ব্যবহার করি। তত্ত্ব ও অনুকল্পের মধ্যে কিছু চলক অন্য চলকের পূর্বে অবস্থান করে। নির্ভরশীল চলককে নিয়েই গবেষকের আগ্রহ বেশী। এটি অন্য চলকের উপর নির্ভরশীল, যা এটির পূর্বে অবস্থান করে। যে সকল চলক অন্য চলকের উপর নির্ভরশীল নয় বা যে সকল চলক অবস্থানগত দিক থেকে অনুকল্পের প্রথমে থাকে, সে সকল চলককে স্বাধীন চলক বা 'পূর্ববর্তী চলক' (antecedent variables) বলে। কার্য-কারণ সম্পর্কিত অনুকল্পে এই চলকগুলোকে 'কারণ' এবং নির্ভরশীল চলকগুলোকে 'ফলাফল' বলে অভিহিত করা হয়। যে সকল চলক নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের মাঝখানে অবস্থান করে সেগুলোকে 'মধ্যবর্তী চলক' (intervening variables) বলে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝা যাক। ধরা যাক, নির্বাচনে ভোটারদের ভোট দেবার আচরণ সম্পর্কিত একটি গবেষণায় গবেষক অনুমান করলেন যে, কোন রাজনৈতিক দলের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সংশ্লিষ্টতা থাকলে সমর্থকদের দলীয় আনুগত্য প্রত্যহারের মাত্রা কম হবে। এ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা হলো স্বাধীন চলক এবং দলীয় আনুগত্য হলো নির্ভরশীল চলক। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী চলক হিসাবে গণমাধ্যমের সাথে পরিচিতির মাত্রার অন্তর্ভুক্তি ব্যক্তির দলীয় আনুগত্যের মধ্যে তারতম্য ঘটাতে পারে। যেমন, একজন সমর্থকের যদি গণমাধ্যমের সাথে কোন পরিচিতি না থাকে, তবে তার আনুগত্যের মাত্রার মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ, সেই রাজনৈতিক দলের ঋণাত্মক দিক সম্পর্কে সেই সমর্থক কোন খোঁজ খবর রাখবেন না। ফলে তার বিশ্বাসের মাত্রা অটুট থাকবে। আবার যদি একজন সমর্থক গণমাধ্যমের সাথে খুব বেশী পরিচিত হন, তবে তিনি দল সম্পর্কে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সব ধরণের তথ্য প্রাপ্তীর মাধ্যমে দলের কর্মকান্ডকে মূল্যায়ন করবেন এবং তিনি তার দলীয় আনুগত্য প্রত্যাহার করবেন না। কিন্তু যদি একজন সমর্থক গণমাধ্যমের সাথে অনিয়মিতভাবে পরিচিত থাকেন, তবে তিনি পূর্ণ তথ্য পাবেন না এবং ফলস্বরূপ আংশিক ঋণাত্মক তথ্যের ভিত্তিতে আস্থাহীনতায় ভুগবেন এবং দলীয় আনুগত্য প্রত্যাহার করবেন। চলক তিনটির মধ্যে বর্ণিত সম্পর্কটিকে

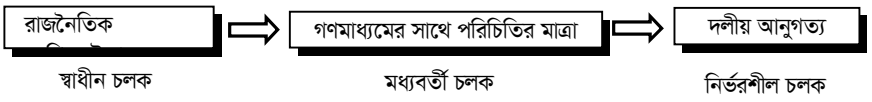

চিত্র ৪.২.১: স্বাধীন, মধ্যবর্তী ও নির্ভরশীল চলকের সম্পর্ক

নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়:

পূর্ববর্তী (antecedent) চলককে এই সম্পর্কের মধ্যে যুক্ত করে স্বাধীন-মধ্যবর্তী-নির্ভরশীল চলকের এই সম্পর্কটিকে আরো সম্প্রসারিত করা যায়। পটভূমী বা পরিস্থিতি এরকম একটি পূর্ববর্তী চলক হতে পারে। যেমন, শান্ত পরিস্থিতিতে মানুষ গণমাধ্যমের প্রতি তেমন আগ্রহী হয় না বলে ভোটের আচরণের মধ্যে তেমন পরিবর্তন হয় না এবং দলীয় আনুগত্যও প্রায় অটুট থাকে। কিন্তু অশান্ত পরিস্থিতিতে যখন সংঘাত ও পরিবর্তন একটি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, তখন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং দলীয় আনুগত্যের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে।

যখন কার্য-কারণ বিশে- ষণের জন্য বহু-চলকবিশিষ্ট পথ-বিশে- ষণ করা হয়, তখন যে স্বাধীন চলকটিকে আর ব্যাখ্যা করা যায় না সেই চলককে বহিঃস্থিত চলক বলে এবং এই চলক ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যবর্তী সকল চলককে অন্ড়রিত চলক বলে।

যখন কার্য-কারণ বিশ্লেষণের জন্য বহু-চলকবিশিষ্ট পথ-বিশ্লেষণ করা হয়, তখন যে স্বাধীন চলকটিকে আর ব্যাখ্যা করা যায় না, সেই চলককে বহিঃস্থিত চলক বলে এবং এই বহিঃস্থিত চলক ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যবর্তী সকল চলককে অন্তরিত চলক বলে। এই অন্তরিত চলকগুলো অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কখনো কখনো স্বাধীন চলক, আবার কখনো কখনো নির্ভরশীল চলকের ভূমিকা পালন করে। সম্পর্কটি চিত্র ৪.২.২ -এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা যাক। এ ক্ষেত্রে, বাসস্থান হলো বহিঃস্থিত চলক, সন্তান সংখ্যা, নির্ভরশীল চলক এবং শিক্ষা, পেশা ও আয় হলো অন্তরিত চলক। কিন্তু বাসস্থান শিক্ষা, পেশা আয় ও সন্তান সংখ্যার জন্য স্বাধীন চলক। আবার শিক্ষা, পেশা, আয় ও সন্তান সংখ্যা বাসস্থানের নির্ভরশীল চলক।

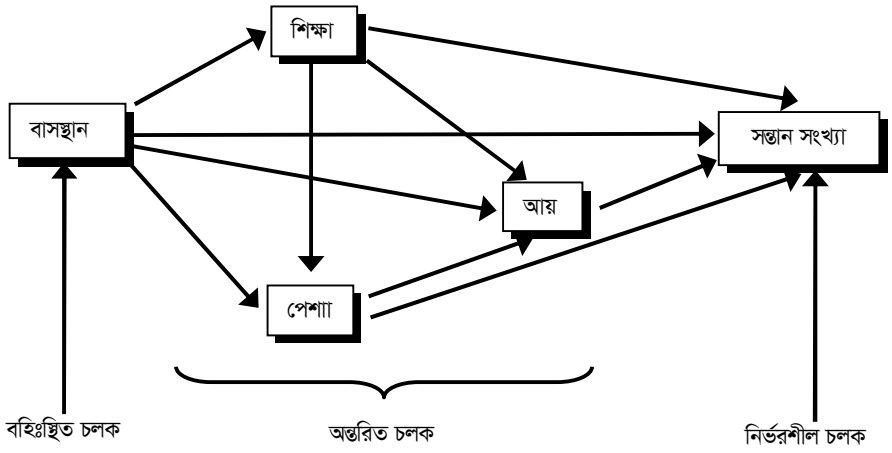

চিত্র ৪.২.২: বহিঃস্থিত, অন্তরিত ও নির্ভরশীল চলকের সম্পর্ক

স্বাধীন চলক ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে অবস্থিত মধ্যবর্তী চলককে পরীক্ষা চলকও (test variable) বলা হয়ে থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক । একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে পড়েছে কিনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের প্রাপ্ত গ্রেডের ভিত্তিতে সাজানো হলে দেখা গেল যে, যারা সরকারী স্কুলে পড়াশোনা করেছে তাদের গ্রেড বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রেডের তুলনায় ভালো। আপাতঃদৃষ্টিতে এই ফলাফল দেখে মনে হতে পারে যে, স্বাধীন চলক হিসাবে সরকারী বা বেসরকারী স্কুলের প্রস্তুতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত গ্রেডকে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু কেউ যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নীতিমালা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন তবে তিনি সন্দেহ করতে পারেন যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মধ্যবর্তী সময়ে এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে হয়তো ফলাফল এমনটি হয়েছে। অতএব, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমকে মধ্যবর্তী চলক হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে। যদি ভর্তি প্রক্রিয়ায় বেসরকারী স্কুলের তুলনায় সরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চতর মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়, তবে স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে যে সম্পর্ক পূর্বে পাওয়া গিয়েছিল তা আর থাকবে না। এ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুলের রেকর্ড হলো 'পরীক্ষা চলক'।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিজ্ঞান সত্যের যথার্থতা যাচাই-এর লক্ষ্যে পদ্ধতি ও কৌশল এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুনিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানদন্ডগুলোকে সরবরাহ করে। এই মানদন্ডগুলো পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল।

একটি পরীক্ষা চলক মধ্যবর্তী চলক না হয়ে পূর্ববর্তী চলকও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে, একটি পর্যবেক্ষণকৃত সম্পর্ক একটি তৃতীয় উপাদানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়, যা স্বাধীন চলকেরও পূর্বে ঘটে এবং যা স্বাধীন ও নির্ভরশীল দু'টি চলকের সাথেই সম্পর্কিত । যেমন, ধরা যাক, জন্মহার সম্পর্কিত একটি গবেষণায় দেখা গেল যে, অর্থনৈতিক মর্যাদার সাথে জন্মহারের একটি ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে, দু'টি চলকই প্রাপ্ত বয়সের অভিজ্ঞতার পরিমাপ। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় যে, এমন কি কোন চলক ছিল যার সাথে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে এই ঋণাত্মক সম্পর্কটি তৈরি হতে পারে? শিক্ষাকে এমন একটি পূর্ববর্তী চলক বিবেচনা করে যখন শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে অর্থনৈতিক মর্যাদা ও জন্ম হারের সম্পর্ককে আলাদাভাবে দেখা হলো, তখন অর্থনৈতিক মর্যাদার সাথে জন্মহারের সেই ঋণাত্মক সম্পর্কটি আর রইলো না। একটি পরীক্ষা চলক ব্যবহারের ফলে পূর্বের ব্যাখ্যাটি অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক মর্যাদা ও জন্মহারের প্রাপ্ত সম্পর্কটিকে একটি মেকি সম্পর্ক বলা যায়।

সারাংশ

গবেষণায় ব্যবহৃত চলকসমূহের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে গবেষণার চালচিত্র। সমস্যা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে চলকের পরিচয়। অর্থাৎ, কোন কোন সময় কিছু কিছু চলক স্বাধীন চলক হিসাবে কাজ করে, আবার কোন কোন সময় স্বাধীন চলকগুলো নির্ভরশীল চলকে রূপান্তরিত হয়। বর্তমান পাঠে প্রত্যয়, চলক এবং চলকের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েই মূলতঃ আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ চলকের ব্যবহারের মধ্যে স্বচ্ছতা না থাকলে গবষণার ফলাফল বিশ্লেষণে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। ফলে গবেষককে চলক নির্বাচন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে তত্ত্বগতভাবে পরিস্কার ধারণার অধীকারী হতে হয়। অন্যথায়, গবেষণায় ইপ্সিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। পদের কার্যকর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে:

ক. প্রত্যয় ব্যবহার বলে
খ. প্রত্যয় পাতানো বলে
গ. প্রত্যয়িকরণ বলে
ঘ. উপরের সব।

২। উপাত্ত বিশ্লেষণে যে চলককে গবেষক ব্যাখ্যা করতে চান সেই চলককে:

ক. স্বাধীন চলক বলে
খ. নির্ভরশীল চলক বলে
গ. মুক্ত চলক বলে
ঘ. অধীন চলক বলে।

৩। বহু-চলকবিশিষ্ট পথ-বিশ্লেষণে যে স্বাধীন চলকটিকে আর ব্যাখ্যা করা যায় না সেই চলককে:

ক. পরীক্ষা চলক বলে
খ. মধ্যবর্তী চলক বলে
গ. বহিঃস্থিত চলক বলে
ঘ. অন্তরিত চলক বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রত্যয় কী?

২। চলক কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রত্যয় কী? প্রত্যয়ের কার্যাবলী আলোচনা করুন?

২। চলক কী? চলকের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ আলোচনা করুন?

পাঠ - ৩

অনুকল্প
Hypothesis

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- অনুকল্প কী
- অনুকল্পের উৎস
- অনুকল্পের প্রকারভেদ
- অনুকল্প নির্মাণে সমস্যা
- অনুকল্প পরীক্ষা কী
- অনুকল্প পরীক্ষার প্রকারভেদ

অনুকল্প কী (What is Hypothesis)?

একজন গবেষক বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে যে 'জ্ঞানদিপ্ত অনুমান' করেন সেই অনুমানগুলো হলো অনুকল্প।

তথ্যমালাকে অর্থপূর্ণ হতে হলে তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কারণ, তত্ত্ব তথ্যরাশিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং এর অর্থ প্রদান করে। তত্ত্ব তথ্য অনুসন্ধানের দিক নির্দেশনাও দিয়ে থাকে। যখন তথ্যরাশিকে একত্রিত করে শৃঙ্খলিত করার পর একটি সম্পর্কের মধ্যে দেখা হয় এবং বার বার পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সেই সম্পর্কগুলো প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী রূপ পেতে থাকে, তখন তা তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, তত্ত্ব কোন অনুমান নয়, বরং তা তথ্যের উপর নির্মিত কিছু যৌক্তিক সম্পর্কের সম্মিলন। তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তথ্যরাশিকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় এবং তথ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সম্পর্কের অনুমান করা যায়। একজন গবেষক বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে যে 'জ্ঞানদিপ্ত অনুমান' (enlightened guess) করেন সেই অনুমানগুলো হলো অনুকল্প। এই অনুমানগুলো সত্য কি না তা এ পর্যায়ে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। কিন্তু এই সূত্রবদ্ধ অনুমানগুলোই অনুকল্প গঠন করে এবং এগুলো যথার্থতা প্রমাণিত হলে সেগুলো ভবিষ্যৎ তত্ত্ব গঠনের অংশে পরিণত হয়। অর্থাৎ, অনুকল্প বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক। অন্য কথায়, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ অনুমানমূলক প্রস্তাবনাগুলো হলো অনুকল্প এবং এগুলোর যথার্থতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা করা যায়। আমরা প্রকৃতপক্ষে যা অনুসন্ধান করতে চাই অনুকল্প তা বর্ণনা করে।

অনুকল্প গঠনের অনুমানগুলো পূর্বে পরিচালিত গবেষণা বা তত্ত্ব থেকে আহরিত হয়। আমরা তত্ত্ব থেকে ইতোমধ্যে যা জেনেছি, যদি তা দিয়ে শুরু করি, তবে দুই বা ততোধিক চলক কিভাবে সম্পর্কিত সে সম্পর্কে যৌক্তিক অনুমান করতে পারি। যেমন, জৈবিক চাপ তত্ত্ব (biological stress theory) অনুযায়ী দীর্ঘ-স্থায়ী শারীরিক চাপ অবশেষে উচ্চ রক্ত চাপ তৈরি করে এবং সামাজিক আত্মিকরণ তত্ত্ব (social assimilation theory) অনুযায়ী, একটি ভিন্ন সংস্কৃতিতে আত্মিকরণ সহজাতভাবেই মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এই দু'টি তত্ত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, যে সকল অভিবাসী (immigrants) নতুন সংস্কৃতিতে খাপ খাইয়ে নিতে খুব বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হন তাঁরা যারা অসুবিধার সম্মুখীন হন না তাদের চেয়ে বেশী উচ্চ রক্ত চাপে ভুগবেন।

একটি অনুকল্পকে উপযোগী হতে হলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা অত্যাবশ্যক। যেমন, অনুকল্পকে অবশ্যই প্রত্যয়গতভাবে সুস্পষ্ট হতে হবে। অনুকল্পের অভিজ্ঞতাযোগ্য স্মারক (empirical referent) থাকতে হবে। অনুকল্পকে সুনির্দিষ্ট হতে হবে। অনুকল্পকে বিশ্লেষণের বিদ্যমান কৌশল এবং তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে।

অনুকল্পের উৎস (Sources of Hypothesis)

যে সংস্কৃতিতে একটি বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে তা অনেক মৌলিক অনুকল্পের জন্ম দেয়।

অনুকল্পের উৎপত্তি হয় বিভিন্ন উৎস থেকে। *প্রথমতঃ*, যে সংস্কৃতিতে একটি বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে সেই সংস্কৃতি অনেক মৌলিক অনুকল্পের জন্ম দেয়। দেখা যায় যে, বিভিন্ন সমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, গতিশীলতা ও প্রতিযোগিতামূলক আচরণ সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা থেকে বিভিন্ন ধারণার জন্ম নেয় এবং ভিন্ন ভিন্ন অনুকল্পের উৎপত্তি হয়। যেমন, বাংলাদেশের পরিবার গঠনের প্রক্রিয়া, ধরণ ও উদ্দেশ্যের সাথে আমেরিকা ও ইউরোপীয় সমাজের পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য থেকে বিভিন্ন অনুকল্প নির্মিত হয়। বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তিক সুখবোধ সম্পর্কে ধারণার ভিন্নতা থেকে বিভিন্ন অনুকল্পের জন্ম নেয়। এমন কি, একটি সামাজের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের কারণেও ভিন্ন অনুকল্প নির্মিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন অনুকল্পের জন্ম হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন অনুকল্পের জন্ম হয়। যেমন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাজার সম্পর্কের প্রকৃতি এক ধরণের অনুকল্পের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানে কৃষি সম্পর্কের বাস্তবতা ভিন্ন ধরণের অনুকল্প তৈরি করে। জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে জনবিজ্ঞানীরা আরেক ধরণের অনুকল্প পরীক্ষা করে থাকেন।

তুলনা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ অনুকল্পের জন্ম দেয়।

তৃতীয়তঃ, তুলনা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ অনুকল্পের জন্ম দেয়। যেমন, ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনের তত্ত্বকে হার্বার্ট স্পেন্সার সামাজিক বিবর্তনে প্রয়োগ করেছেন। রেমন্ড পার্ল মাছির প্রবৃদ্ধির হারকে মানুষের সাথে তুলনা করে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারকে বিশ্লেষণ করেছেন। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রতিবেশ (ecology) সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রয়োগ করে মানুষের প্রতিবেশের তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। এর ফলে অনেক নতুন অনুকল্পের জন্ম নিয়েছে এবং পরীক্ষিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুকল্পের জন্ম হয়।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুকল্পের জন্ম হয়। যেমন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী থমাস হেন্‌রী হাক্সলী ডারউইনের লেখা 'Origin of Species' গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, তিনি এত নির্বোধ কেন? কেন তিনিও ডারউইনের মত এমনভাবে চিন্তা করেন নি? মজার বিষয়টি হলো, ডারউইনের সংগৃহীত অজস্র তথ্যরাশি ততক্ষণ পর্যন্ত একটি শৃঙ্খলিত রূপ নেয় নি যতক্ষণ না একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে। তিনি প্রজাতিসমূহের পরিবর্তনের কারণটি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ম্যালথাসের জনসংখ্যার নীতিমালার উপর রচনাটি পড়ার পরই তিনি 'Struggle for Survival'-এর ধারণাটির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। একইভাবে, গাছ থেকে আপেল পড়ার ঘটনা থেকে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের জন্ম এবং চৌবাচ্চা থেকে পানি ছলকে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে আর্কিমিডিসের সোনায় খাদ পরিমাপের উপায় নির্ধারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনুকল্পের উৎপত্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অনুকল্পের প্রকারভেদ (Types of Hypothesis)

পন্ডিতগণ বিমূর্ততার মাত্রার ভিত্তিতে অনুকল্পকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

অনুকল্পকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। তবে পন্ডিতগণ বিমূর্ততার মাত্রার (level of abstraction) ভিত্তিতে অনুকল্পকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো:

১. অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতিসমূহের বর্ণনামূলক অনুকল্প (Hypothesis Concerned with the Description of Empirical Uniformities)
২. জটিল আদর্শ রূপের সাথে সম্পর্কিত অনুকল্প (Hypothesis Concerned with Complex Ideal Types)
৩. বিশ্লেষণের ভিন্নতার সাথে সম্পর্কিত অনুকল্প (Hypothesis Concerned with the Relations of Analytic Variations)

এই তিন ধরণের অনুকল্প সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতিসমূহের বর্ণনামূলক অনুকল্প (Hypothesis Concerned with the Description of Empirical Uniformities): এক ধরণের অনুকল্প রয়েছে যা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতিগুলোর অস্তিত্বকে বর্ণনা করে। এ ধরণের অনুকল্পগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের প্রস্তাবনাগুলোর বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করে। সামাজিক বিজ্ঞানে এ রকম বহু অনুকল্প নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন, একটি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি, একটি শহরের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, একটি দেশের ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, ইত্যাদি। এ ধরণের অনুকল্পগুলো অনেক সময় একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর আচরণের রূপকে বর্ণনা করে। যেমন, প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণী কক্ষের আচরণ, গার্মেন্টস শ্রমিকদের ব্যয়ের প্রকৃতি, ইত্যাদি।

এই সব অনুকল্পের বিরূদ্ধে আপত্তি তোলা যেতে পারে যে, এ ধরণের অনুসন্ধান কখনো অনুকল্প পরীক্ষা করে না। এগুলো কিছু তথ্যের সংযোজন ছাড়া আর কিছু নয়। আরো আপত্তি তোলা যেতে পারে যে, এগুলো কোন উপযোগী অনুকল্প নয়। কারণ, এগুলো সে সকল বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে যা সবারই জানা। এই আপত্তিগুলোর জবাবে বলা যায় যে, সবাই যা জানেন তা সত্য নাও হতে পারে। তথ্যের সাধারণ সংযোজন হলেও এই অনুকল্পগুলো মানুষের সাধারণ জ্ঞানকে গবেষণার মধ্য দিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে এবং বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত করে।

যে কোন বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সূক্ষ্মভাবে সংজ্ঞায়িত প্রত্যয়ের অধীনে সুসংবদ্ধ করা। সামাজিক বিজ্ঞানীর কাজ হলো লোকজ ধ্যান-ধারণাগুলোর কোন অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতি রয়েছে কিনা তা গবেষণার মাধ্যমে পর্যালোচনা করে সেগুলোকে উপযোগী জ্ঞানে পরিণত করা।

যে কোন বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সূক্ষ্মভাবে সংজ্ঞায়িত প্রত্যয়ের অধীনে সুসংবদ্ধ করা। যেমন, সমাজে মানুষ অনেক লোকজ ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রতিদিনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। সামাজিক বিজ্ঞানীর কাজ হলো এই লোকজ ধ্যান-ধারণাগুলোর কোন অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতি রয়েছে কিনা তা গবেষণার মাধ্যমে পর্যালোচনা করে সেগুলোকে উপযোগী জ্ঞানে পরিণত করা; এটি করতে গিয়ে গবেষককে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমতঃ, ধ্যান-ধারণাগুলো থেকে মূল্যবোধ সম্পর্কিত পক্ষপাতকে অপসারণ করতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, ধ্যান-ধারণার অন্তর্ভুক্ত পদগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করতে হয়; এবং তৃতীয়তঃ, যথার্থতার পরীক্ষা প্রয়োগ করতে হয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন, মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে যে, 'সম্পদশালী মানুষেরা সংযমহীন জীবন যাপন করেন বলে তাদের মধ্যে উচ্চ হারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।' এই বক্তব্যটি যেভাবে রয়েছে হুবহু সেভাবে পরীক্ষা করা যাবে না। কারণ, এই বক্তব্য যতটা না তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তার চেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত ভাব-প্রবণতাযুক্ত অনুভূতির উপর। এই বক্তব্যের মধ্যে ব্যবহৃত পদগুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নয়। এই বক্তব্যটিকে তখনই একটি উপযোগী অনুকল্পে পরিণত করা যাবে যখন এর মধ্য থেকে নৈতিকতার বিষয়টি অপসারণ করা হবে এবং পদগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে।

শুধু সামাজিক বিজ্ঞানে নয়, অন্যান্য সকল বিজ্ঞানেই এ ধরণের সাধারণ জ্ঞান অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্ম দিয়েছে। যেমন, এক সময় আমাদের ধারণা ছিল যে, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না, বরং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। আমাদের এও ধারণা ছিল যে, ভূপৃষ্ঠ সমতল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠ সমতল নয়, বরং তা গোলাকার। যাই হোক, সবাই যা জানেন তা প্রকৃত জানা হয় না যতক্ষণ না তা পরীক্ষিত হচ্ছে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতি অনুসন্ধানের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রাথমিক অনুকল্পগুলো বিজ্ঞানের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জটিল আদর্শ রূপের সাথে সম্পর্কিত অনুকল্প (Hypothesis Concerned with Complex Ideal Types): এই অনুকল্পগুলোর লক্ষ্য হলো অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতিগুলোর মধ্যে যৌক্তিকভাবে আহরিত সম্পর্কগুলোর অস্তিত্বকে পরীক্ষা করা। যেমন, অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতির সাথে সম্পর্কিত অনুকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভূমি-সম্পর্ক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ধরণ, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, পেশাগত বিন্যাস এবং এ রকম আরো অন্যান্য প্রপঞ্চের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতি রয়েছে। এই সঙ্গতিগুলোর পরবর্তী যৌক্তিক বিশ্লেষণ নতুন কিছু অনুকল্পের জন্ম দেয়। সেই অনুকল্পগুলোকে আদর্শ রূপ অনুকল্প বলে।

এই বিমূর্ত অনুকল্পগুলো সমাজে জটিল স্মারক (complex referent) তৈরির মধ্য দিয়ে সরল অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতির প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যায়। যেমন, সব শহরই নিখুঁত এককেন্দ্রিক বৃত্তবিশিষ্ট নয়, সমাজের সব মানুষই প্রান্তিক নয়, ইত্যাদি। এ ধরণের পরিস্থিতিতে আদর্শ রূপ অনুকল্প নির্মাণ করে পরীক্ষা করা খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। যেহেতু এগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পর্ককে অতিক্রম করে, সেহেতু এই নির্মাণগুলোকে আদর্শ রূপ বলা হয়ে থাকে। জটিল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এ ধরণের অনুকল্পের প্রধান কাজটি হলো ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য নিত্য নতুন কৌশল তৈরি করা।

বিশ্লেষণের ভিন্নতার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুকল্প (Hypothesis Concerned with the Relations of Analytic Variations): আদর্শ রূপ অনুকল্পের নির্মাণকে অতিক্রম করে বিমূর্তকরণের আরেক ধাপ উপরে উঠে এই অনুকল্পগুলোকে নির্মাণ করা হয়। যেখানে অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতিসম্পন্ন অনুকল্পগুলো প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে সাধারণ পার্থক্যকে পর্যবেক্ষণ করে এবং আদর্শ রূপ অনুকল্পগুলো বিশেষ বিশেষ সমজাতীয় ঘটনার মধ্যে ভিন্নতাকে পর্যবেক্ষণ করে, সেখানে বিশ্লেষণমূলক চলকগুলোর গবেষণার জন্য একটি চলকের একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তনের সাথে অন্য চলকের একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তনের সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে।

যেমন, আমরা জানি যে, মানুষের জন্মশীলতার (human fertility) সাথে সম্পদ, ধর্ম, শিক্ষা, বাসস্থান এবং সম্প্রদায়ের আকারের অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতি রয়েছে। বাংলাদেশের দু'টি অঞ্চলের উচ্চ জন্মশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে এটি বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি হলো চট্রগ্রাম বিভাগ এবং অন্যটি হলো সিলেট বিভাগ। এই দু'টি বিভাগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন, শিক্ষার হার, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় প্রভাব, রক্ষণশীলতার মাত্রা, ইত্যাদি বিবেচনা করে জন্মশীলতার উপর এদের প্রভাবকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এ ধরণের অনুকল্পের নির্মাণ ও পরীক্ষা জন্মশীলতা এবং উল্লিখিত বিভাগ দু'টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ আমাদের জন্মশীলতার গতিশীলতা সম্পর্কে আরো উন্নততর ধারণা ও পরিমাপ দেবে।

এই অনুকল্পগুলো শুধু যে অন্য অনুকল্পগুলোর চেয়ে অধিক বিমূর্ত তাই নয়, এগুলো হলো সবচেয়ে পরিশীলিত নির্মাণ। অনুকল্পের বিমূর্তকরণের এই মাত্রায় যে চলকগুলো নির্বাচন করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয় সেগুলো শুধুমাত্র একটি তত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেহেতু তত্ত্ব নিজেই একটি বিকাশের পর্যায়ে থাকে, সেহেতু তত্ত্বের বিকাশে নতুন নতুন বিশ্লেষণমূলক গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকে এবং বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হতে থাকে।

অনুকল্প নির্মাণে সমস্যা (Problems in Formulating Hypothesis)

অনুকল্প ছাড়া গবেষণাকে লক্ষ্যহীন লাগামছাড়া এলোমেলো অভিজ্ঞতামূলক বিচরণ বলা যায়।

সুষ্ঠু এবং সঠিক গবেষণা পরিচালনার জন্য অনুকল্পের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, অনুকল্প ছাড়া গবেষণাকে লক্ষ্যহীন লাগামছাড়া এলোমেলো অভিজ্ঞতামূলক বিচরণ বলা যায়। অনুকল্প নির্মাণে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তেমনি উপযোগী অনুকল্প নির্মাণে অসুবিধাগুলোকেও মনে রাখা প্রয়োজন। অনুকল্প নির্মাণে গবেষকগণ প্রধানতঃ তিনটি অসুবিধার সম্মুখীন হন। *প্রথমতঃ*, একটি সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোর অভাব বা তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। আমরা আগেই বলেছি যে, অনুকল্প তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। একদিকে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতিগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ তত্ত্বের অংশ হিসাবে গড়ে তুলি এবং অন্যদিকে, বিদ্যমান জ্ঞান কাঠামোর মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রস্তাবনাকে অনুকল্প অনুমান করে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সেগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করি। কাজেই, যদি কোন তাত্ত্বিক কাঠামোর অনুপস্থিতি থাকে বা বিদ্যমান তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থাকে, সে ক্ষেত্রে যথাযথ অনুকল্প নির্মাণ কঠিন হয়ে পড়ে। *দ্বিতীয়তঃ*, তাত্ত্বিক কাঠামোর উপস্থিতি বা তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই শুধু চলবে না, একজন গবেষকের সেই তাত্ত্বিক কাঠামোকে ব্যবহারের দক্ষতা থাকতে হবে। এই দক্ষতার অভাব অনেক সময় উপযোগী অনুকল্প নির্মাণে সমস্যা তৈরি করে। *তৃতীয়তঃ*, একজন গবেষকের জন্য গবেষণা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকা এবং সেই তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহারের দক্ষতা থাকাই যথেষ্ট নয়। তিনি যদি সেই তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহারের জন্য

বিদ্যমান কৌশলগুলো সম্পর্কে অবহিত না থাকেন তবে তাঁর পক্ষে উপযোগী অনুকল্প নির্মাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

যদি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করা হয় যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পরীক্ষাযোগ্য প্রশ্ন তৈরি করা কতটুকু কঠিন? অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হবে। যদিও বা কেউ কেউ কিছু প্রস্তাবনার উল্লেখ করতে পারবে, কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে, সে সব প্রস্তাবনার অধিকাংশই অনুকল্প নয়। যারা অনুকল্প নির্মাণের কাছাকাছি যেতে পারবে, দেখা যাবে যে, নির্মিত অনুকল্পগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গতির উর্ধে উঠতে পারে নি। যদি আমরা একটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো এবং যথাযথ গবেষণা কৌশল নির্ধারণ করে গবেষণা শুরু করি, তাহলে আমরা দু'টি বা তার অধিক চলকের মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গতি পর্যবেক্ষণ করে একটি উপযোগী অনুকল্প নির্বাচন করতে পারবো।

অনুকল্প পরীক্ষা কী (What is Hypothesis Testing)?

অনুকল্প পরীক্ষা কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নের সামাধান পেতে সাহায্য করে।

নমুনা পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে সমগ্রক সম্পর্কে উপসংহার টানার জন্য যে সব সিদ্ধান্তমূলক পদ্ধতি রয়েছে সে সব পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি পদ হলো 'অনুকল্প পরীক্ষা'। আরো সহজ করে বলা যায় যে, অনুকল্প পরীক্ষা কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নের সামাধান পেতে সাহায্য করে। যেমন, ধুমপান কি ক্যান্সারের কারণ? অনুকল্প পরীক্ষা পার্থক্য নির্ধারণেও সাহায্য করে। যেমন, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কি বলা যায় যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সত্যিকার? সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কি সত্যিই ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে? পরিসংখ্যানগত অনুকল্প পরীক্ষার মাধ্যমে এ সকল কার্য-কারণ সম্পর্কের যথার্থতা প্রমাণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরণের অনুকল্প পরীক্ষা পদ্ধতি সমগ্রকের বাস্তবতা সম্পর্কে গবেষককে একটি পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে। এই সব পদ্ধতি নিরঙ্কুশভাবে কিছুই প্রমাণিত করে না, তবে যখন সম্ভাবনার আকারে উপস্থাপিত হয় তখন এগুলো গবেষককে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে। অন্য কথায়, অনুকল্প পরীক্ষা গবেষককে পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় বলে দেয়।

অনুকল্প পরীক্ষা গবেষককে পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় বলে দেয়।

বিকল্প অনুকল্প $H_1 : \mu_0 \neq k$

যেখানে, H_0 = নাস্তি অনুকল্প

H_1 = বিকল্প অনুকল্প

μ_0 = যে সমগ্রক থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সমগ্রকের গড়

k = ধ্রুবক

অনুকল্প পরীক্ষাকে প্রধানতঃ দু'টি বৃহৎ পরিবারে বিভক্ত করা যায়। একটি পরামাত্রিক এবং অন্যটি হলো অপরামাত্রিক অনুকল্প পরীক্ষার পরিবার।

অনুকল্প পরীক্ষাকে প্রধানতঃ দু'টি বৃহৎ পরিবারে বিভক্ত করা যায়। একটি পরামাত্রিক (parametric) এবং অন্যটি হলো অপরামাত্রিক (non-parametric) অনুকল্প পরীক্ষার পরিবার। পরামাত্রিক পরীক্ষার মূল ধারণাটি হলো যে, নমুনাটি যে সমগ্রক থেকে চয়ন করা হয় সেই সমগ্রকটি স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত এবং সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধানটি জানা থাকে। অনুকল্পগুলো পরামানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত থাকে। পরামাত্রিক পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুকল্পগুলোর জন্য যে পরিসংখ্যান নির্ণীত হয় সেগুলোকে ব্যাপ্তিমূলক বা অনুপাতমূলক মাত্রায় পরিমাপকৃত হতে হয়। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় আমাদের হাতে পরামাত্রিক অনুকল্প পরীক্ষার জন্য শর্ত পূরণ করে এমন উপাত্ত সবসময় থাকে না। এ রকম পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পরিসংখ্যানবিদগণ বেশ কিছু অনুকল্প পরীক্ষা নির্মাণ করেছেন যেগুলো অপরামাত্রিক পরীক্ষা বলে পরিচিত।

অপরামাত্রিক শব্দটির অর্থ এটি নয় যে, যে সমগ্রক থেকে নমুনায়ন করা হয় সেই সমগ্রকের কোন পরামান নেই। পরামাত্রিক পরীক্ষার সাথে অপরামাত্রিক পরীক্ষার পার্থক্যটি হলো যে, পরামাত্রিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগুলো নির্ণয়ের জন্য সমগ্রক সম্পর্কে কোন কঠিন শর্ত আরোপ করা হয়

না। অর্থাৎ, অনুকল্পগুলো পরামানের প্রেক্ষিতে নির্মিত হয় না। অন্য কথায়, অপরামাত্রিক অনুকল্প পরীক্ষাকে বিন্যাসমুক্ত পরীক্ষা বলে। কারণ, এগুলো পরামাত্রিক পরীক্ষার তুলনায় কম শর্তযুক্ত। অবশ্য এই শিথিলতার কারণে পরামাত্রিক পরীক্ষার তুলনায় অপরামাত্রিক পরীক্ষাগুলো কম শক্তিশালী হয় এবং এর ফলে অনেক নাস্তি অনুকল্প প্রত্যাখ্যান করা যায় না, যা পরামাত্রিক পরীক্ষায় করা যেত। অপরামাত্রিক পরীক্ষাগুলো নামসূচক ও ক্রমসূচক মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

পরামাত্রিক পরীক্ষাগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো z-পরীক্ষা, t-পরীক্ষা এবং F-পরীক্ষা। অপরামাত্রিক পরীক্ষাগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় সেটি হলো কাই-বর্গ (Chi-Square) পরীক্ষা, যা χ^2-পরীক্ষা নামে পরিচিত। এ ছাড়াও এই পরিবারে রয়েছে Wilcoxon Matched-Pairs Single Ranked Test এবং Wilcoxon Rank-Sum Test।

সারাংশ

এই পাঠে আমরা গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুকল্প নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনায় অনুকল্পের সংজ্ঞা, উৎস, প্রকারভেদ, অনুকল্প নির্মাণে সমস্যা, অনুকল্প পরীক্ষা ও অনুকল্প পরীক্ষার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। অনুকল্প হলো জ্ঞানদিপ্ত অনুমান। গবেষণার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে যথাযথ অনুকল্প প্রণয়ন। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা নির্ভর করে অনুকল্প পরীক্ষার উপর। অনুকল্প পরীক্ষার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে যা এই পাঠের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন গবেষককে গবেষণা শুরুর পূর্বে যথাযথ অনুকল্প প্রণয়ন করেই গবেষণা কাজ শুরু করা উচিৎ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। অনুকল্পের প্রকারভেদ নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে:

ক. বিমূর্ততার ধরণ
খ. বিমূর্ততার মাত্রা
গ. বিমূর্ততার সংখ্যা
ঘ. উপরের সব।

২। বর্ণনামূলক অনুকল্পের সমালোচনা করা হয় এই বলে যে:

ক. বর্ণনামূলক অনুকল্পে পরীক্ষার সম্ভাবনা থাকে না
খ. বর্ণনামূলক অনুকল্প তথ্যের সংযোজন ছাড়া অন্য কিছু নয়
গ. বর্ণনামূলক অনুকল্প উপযোগী অনুকল্প নয়
ঘ. উপরের সব।

৩। অনুকল্প পরীক্ষাকে প্রধানতঃ

ক. দু'টি পরিবারে বিভক্ত করা যায়
খ. চারটি পরিবারে বিভক্ত করা যায়
গ. ছয়টি পরিবারে বিভক্ত করা যায়
ঘ. আটটি পরিবারে বিভক্ত করা যায়।

৪। পরামাত্রিক পরীক্ষার সাথে অপরামাত্রিক পরীক্ষার পার্থক্য হলে, পরামাত্রিক পরীক্ষায়:

ক. অনুকল্পগুলো পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়
খ. অনুকল্পগুলো পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয় না
গ. অনুকল্পগুলো পরামানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়
ঘ. অনুকল্পগুলো পরামানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অনুকল্প কী?

২। অনুকল্প নির্মাণের সমস্যা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অনুকল্প কী? অনুকল্পের প্রকারভেদগুলো আলোচনা করুন।

২। অনুকল্পের পরীক্ষাগুলো আলোচনা করুন।